১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা

দীর্ঘ দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তা দেশের মানুষের শোষণমুক্তি ঘটায়নি। কীভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ফলে দেশের আপামর জনসাধারণের জীবনে এই স্বাধীনতা আরেকটি শোষণমূলক অধ্যায়ের সূচনা করল তা ব্যাখ্যা করে স্বাধীনতার দুই দশক পরে স্বাধীনতা দিবসে প্রদত্ত ভাষণে কমরেড ঘোষ তাঁর অনন্য ও অন্তর্ভেদী মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বহু মৌলিক বিষয় ও প্রশ্নের উপর আলোকপাত করেছেন। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ছিল রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র, সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক, বিপ্লবীরা বুর্জোয়া সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে, ভারতবর্ষের মতো একটি পুঁজিবাদী দেশে আইন ও শৃঙ্খলার স্বরূপ কী, ভারতবর্ষের সঙ্কট-জর্জরিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি কেন সামরিকীকরণের দিকে ঝুঁকেছে, বিপ্লবীরা কীভাবে প্রতিটি আন্দোলনকে বিপ্লবের পরিপূরক করে গড়ে তুলবে ইত্যাদি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গত বিশ বছর ধরে আমরা পার্টির তরফ থেকে স্বাধীনতা দিবসকে 'গণমুক্তি সংকল্প দিবস' হিসাবে পালন করে আসছি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বাধীনতা দিবসকে আমরা কেন 'গণমুক্তি সংকল্প দিবস' হিসাবে পালন করছি।

স্বাধীনতা দেশে আসেনি — এ কথা আমরা বলতে চাইছি না, বা আমরা তা বিশ্বাসও করি না। আমরা মনে করি, দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার ত্রুটিবিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা, দেশের শাসকগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতি আনুগত্য ও নমনীয় মনোভাব, তাদের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতি, সামন্ততন্ত্রের সাথে আপসমুখী মনোভাব ও সর্বোপরি দেশের শাসনব্যবস্থাকে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালনা — এসব সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে।

তবে আমরা স্বাধীনতা দিবস একটা উৎসব হিসাবে উদ্‌যাপন না করে গণমুক্তি সংকল্প দিবস হিসাবে কেন উদ্‌যাপন করছি? তার কারণ, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা অন্যতম লক্ষ্য জনসাধারণের সামনে ছিল স্বাধীনতা লাভ ও সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন। সেই উদ্দেশ্য, সেই লক্ষ্য বর্তমান স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কাঠামো জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের বুকের উপর চেপে বসেছে তার দ্বারা পরিপূরিত তো হয়ইনি, উপরন্তু জনসাধারণের সে আশা-আকাঙক্ষাকে রূপায়িত করার পথে তা আজ একটা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই বাধা হটাতে না পারলে শোষণ থেকে জনসাধারণের মুক্তি অসম্ভব।

ভারতবর্ষের সমাজ শ্রেণীবিভক্ত

আমরা যখন বলি, ভারতবর্ষের সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, অনেকে মনে করতে পারেন যে, এটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের একটা বলবার ফ্যাশন বা নিজেদের একটা কথা। ভারতবর্ষের সমাজ যে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় সমাজ নয় বা একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি নয়, এটা যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, তা মার্কসবাদীদের একটা বানানো কথা নয়। ভারতবর্ষের খেটেখাওয়া মানুষ, সাধারণ মানুষ যাঁরা একেবারে নিচু তলার লোক, যাঁরা কায়িক শ্রম করেন, তাঁদের থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায় — এঁরা সবাই একটা বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণী। তাঁরা দেশের সম্পদের মালিক নন, দেশের সম্পত্তি যা গড়ে উঠছে বা উৎপাদন যন্ত্র যার মধ্য দিয়ে দেশের সম্পদ গড়ে ওঠে, তার মালিকানা তাঁদের হাতে নেই। এঁরা শুধু নিজেদের পরিশ্রম বিক্রি করছেন, সেই পরিশ্রম কাজে লাগছে উৎপাদনের, তার দ্বারা দেশের উৎপাদন হচ্ছে, মালিকশ্রেণীর হাতে মুনাফার পাহাড় জমা হচ্ছে, আর কোনমতে এঁরা নিজেদের পেট পূরণ করছেন। আর এক দল হচ্ছে — যারা

দেশের উৎপাদন যন্ত্রের মালিক, কলকারখানার মালিক, ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক এবং তাদের এই ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা চালাবার অধিকার, ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের ওপর ভিত্তি করে যে উৎপাদন ব্যবস্থা তার মালিকানা ও কর্তৃত্বের অধিকার বজায় রাখবার জন্যই এ দেশে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের পরিপূরক 'সোস্যাল সেন্স অব জাস্টিস'-এর (সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার) উপর ভিত্তি করেই 'ল অ্যান্ড অর্ডার' বা আইন-শৃঙ্খলার কাঠামোটি এদেশে গড়ে উঠেছে।

এদেশে এই যে বিভাজন — শহরে শ্রম বিক্রি করে যারা দিন চালান তারা আর মালিকশ্রেণী, গ্রামে চাষী আর জোতদারশ্রেণী বা ধনী চাষী — এই বিভক্তি কোনমতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। এ আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সৃষ্টি করিনি। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এর সৃষ্টি হয়েছে। আজকের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা ও তাদের দালাল চিন্তাবিদ্‌রা তাদের কোন মনগড়া যুক্তির দ্বারা এ সত্যকে উড়িয়ে দিতে পারে না। কারণ ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেরই জানা উচিত যে, শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্বের স্রষ্টা মার্কস নন, রেনেসাঁসের যুগে বুর্জোয়ারাই এই তত্ত্বের জন্মদাতা। মার্কস শুধু শ্রেণীসংগ্রামের ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও শ্রেণীসংগ্রামের 'কাল্‌মিনেশন' (অবশ্যম্ভাবী পরিণতি) হিসাবে 'সর্বহারার একনায়কত্ব' তত্ত্বের জন্মদাতা।

তাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক ও শোষিতের কাছে 'স্বাধীনতা' কথাটার মানেও আলাদা, 'দেশের স্বার্থ' কথাটার মানেও আলাদা। এ কথাকে যারা অস্বীকার করতে চায় এবং জনসাধারণের কাছে সত্য চেপে যারা 'জাতীয় স্বার্থ', 'স্বাধীনতা'র নামে গোটা দেশের স্বার্থের একটা সাধারণ ব্যাখ্যা দেয়, তারা আমার ভাষায় হয় কিছু জানে না, না হয় জেনেশুনে জোচ্চুরি করছে। জেনেশুনে মানুষকে ঠকাচ্ছে। তাদের এ সোজা সত্য কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে, আমাদের দেশে আজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একদিকে মালিকশ্রেণী, আরেকদিকে শ্রমিকশ্রেণী-খেটেখাওয়া-বেকার জনসাধারণ — চাষী, মজুর, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীরা। তোমরা দেশের স্বার্থ বলতে কাদের স্বার্থ বোঝাতে চাইছ ? আইন-শৃঙ্খলা দেশের স্বার্থের জন্য দরকার। যদি এই বিরাট জনতাকে বাদ দিয়ে দেশের স্বার্থ হয়, তাহলে তা গিয়ে দাঁড়ায়, হয় খানিকটা জলমাটি, না হয় এই মালিকশ্রেণীর স্বার্থ। সে দেশের স্বার্থের সাথে জনসাধারণের সম্পর্ক কী? আর 'দেশ' বলতে যদি এই বিরাট জনসমুদ্রকে বোঝায় — তাহলে দেশের স্বার্থে 'ল অ্যান্ড অর্ডার' জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে না, জনগণকে ঠকাতে পারে না, জনগণকে পেটাতে পারে না, জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করতে পারে না, মালিকের স্বার্থরক্ষাকে দেশের স্বার্থ বলতে পারে না, মালিকের আবদার রক্ষা করার নাম দেশের আইনকানুন রক্ষা করা বলতে পারে না। 'দেশ' মানে তো মালিক নয়! অথচ 'আইন' 'আইন' করে যারা চিৎকার করছেন তাঁদের বক্তব্যগুলো বিচার করলে শেষপর্যন্ত গিয়ে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, দেশের নামে নির্লজ্জভাবে মালিকশ্রেণীর স্বার্থের ওকালতি।

মালিকশ্রেণীর প্রভাবাধীন কংগ্রেস

গোড়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের দেশের শোষিত জনসাধারণ এবং মালিকশ্রেণীর একটা সম্প্রদায় — দু'দলই এসেছিল। যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র তাঁরা জানেন যে, টাটা-বিড়লা গোষ্ঠীর মত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক মালিকশ্রেণীর একটা অংশ, বুর্জোয়াদের একটা অংশ কংগ্রেসকে 'ফাইন্যান্স' (আর্থিক প্রয়োজন বহন) করেছে। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস আমলে অতীত ইতিহাসের একটা সময়ে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের একটা হুঁশিয়ারির কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যখন কংগ্রেস কর্মীদের খরচ চালাবার জন্য, অর্থাৎ যারা কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী, যারা কংগ্রেসের প্রচার করবে, আন্দোলন করবে, তাদের জন্য পয়সা সংগ্রহের ব্যাপারে কংগ্রেসের একদল নেতা, যার মধ্যে গান্ধীজিও ছিলেন, ওকালতি করেছিলেন যে, মালিকরা যদি টাকা দেয়, দেশের স্বার্থের জন্য তা নেওয়া চলতে পারে, কারণ কংগ্রেসের কাজ চালাতে হবে। লালা লাজপত রায় একটা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন — কংগ্রেসের পয়সার দরকার আছে ঠিকই, কিন্তু যদি মালিকদের পয়সায় কংগ্রেস কর্মীদের খরচ এবং কংগ্রেসের খরচ চালানোর রাস্তায় কংগ্রেস নেতারা পা দেন তাহলে মালিকদের ফাঁদেই তাঁরা পা দেবেন, সেই ফাঁদ থেকে তাঁরা কোনদিনই বেরিয়ে আসতে পারবেন না। লালা লাজপত রায়ের সেই হুঁশিয়ারি সেদিন কেউ শোনেননি। ফলে গোটা কংগ্রেসি আন্দোলন এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব মালিকশ্রেণীর জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে গেল — তা পণ্ডিতজিই হোন, আর গান্ধীজিই হোন এবং তাঁদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে যত টগবগে আবেগই থাকুক না কেন, এ বাস্তব

সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মালিকশ্রেণী এসেছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে — এসেছিল টাকা পয়সা দিয়ে মদত করতে। তারা দেশপ্রেমিক সেজেছিল। আর চাষী, মজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত, ছাত্র সম্প্রদায় — তারাও স্বাধীনতা আন্দোলনে এসেছিল। এই দুটো শ্রেণীতে দেশের সমাজ তখনই বিভক্ত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই জমিদার-চাষী, মালিক-মজুর এইভাবে দেশ বিভক্ত। আমরা একটা অবিভক্ত জাতি ছিলাম না। ইতিহাসে কোন জাতিই ঐক্যবদ্ধ জাতি নয়। ঐক্যবদ্ধ জাতি কথাটার দুটো মানে হয়। এক বুর্জোয়া স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ তা, আর না হয় জনসাধারণের স্বার্থে জাতির বেশিরভাগ মানুষের ঐক্যবদ্ধ তা। 'জাতীয় ঐক্য' কথাটা যেখানে যখন যেভাবেই 'পলিটিক্যালি' (রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে) বলা হোক না কেন — জাতীয় ঐক্যবদ্ধ তার এই দু'টি মাত্র সংজ্ঞা হয়।

দুই শ্রেণী দুই লক্ষ্য

জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল এইজন্য যে, ইংরেজকে না তাড়ালে এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, যে সমাজে অন্যায়, অবিচার এবং পুঁজিবাদী জুলুম, ব্যবসাদারদের জুলুম, জমিদারদের জুলুম, 'ব্যুরোক্রেসি'র (আমলাতান্ত্রিকতার) জুলুম — এই সমস্ত জুলুমের চিরতরে অবসান ঘটবে এবং যে সমাজে আমাদের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির সুযোগ, ব্যক্তির বিকাশের সমান সুযোগ, সমস্ত স্তরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ, জনগণের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সর্বরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ, আর সর্বাত্মক ভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক ভাবে সমাজের কল্যাণ, অর্থাৎ জনগণের অর্থে সামগ্রিক কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া যাবে।

আর মালিকশ্রেণী — যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে এসেছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ উলটো। আমাদের দেশের এই তেতাল্লিশ কোটি লোক অধ্যুষিত যে লুটের বাজারটি, সেটি নিংড়ে তার পুরো রসটি নিয়ে যাচ্ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, বিদেশি পুঁজিপতিরা। আর দেশীয় পুঁজিপতিরা ছিল তাদের ছোট হিস্যেদার। বিদেশি শাসনের জন্য এই বিরাট লুটের বাজারে ভারতবর্ষের পুঁজির অবাধ বিস্তার, শোষণ এবং লুণ্ঠনের বাজারটি তারা পাচ্ছিল না। তাই তাদের দরকার ছিল দেশের রাষ্ট্রক্ষমতাটাকে পাওয়া, শুধু রাষ্ট্রযন্ত্রটি ব্রিটিশের হাত থেকে নেওয়া — বিপ্লব নয়, সমাজের মৌলিক পরিবর্তন নয়। ব্রিটিশ থাকবে না — তার জায়গায় একটা শাসন ক্ষমতা যেটা ব্রিটিশই প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের কর্তৃত্বাধীনে আসবে। দেশ স্বাধীন হবে, তারা সেই রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হবে। ফলে তেতাল্লিশ কোটি লোকের বাজারে তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদকে আরও সংহত করবে এবং মানুষের বুকে জগদ্দল পাথরের মত পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ প্রতিষ্ঠিত করবে স্বাধীনতার জয়ডঙ্কা বাজিয়ে দেশোন্নয়নের নামে, দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনার নামে — এই ছিল বুর্জোয়াদের শয়তানি এবং রাজনীতি এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে এই চিন্তা, এই আদর্শ (!) চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই টাকাপয়সা দিয়ে তারা আন্দোলনে সাহায্য করেছিল।

দেশবিভক্তির কুফল

দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, তা সে যে ভাবেই হোক্ না কেন। স্বাধীনতা 'কম্প্রোমাইজ' (আপস) করে এসেছে, তার কী কুফল — এর বিস্তারিত আলোচনায় আমি যেতে চাই না। শুধু দেশবিভক্তির ফলে যে মারাত্মক ক্ষতি এই দেশে ঘটেছে সে সম্পর্কে এইটুকুই আমি বলতে চাই যে, একটা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে একটা বিরাট জাতি, একটা ঐক্যবদ্ধ জনতা, একটা জনসমুদ্র, একটা জনসংখ্যা — তাকে জোর করে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হ'ল, দুটো জাতিতে পরিণত করে দেওয়া হ'ল, দুটো দেশে পরিণত করে দেওয়া হ'ল। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে, দু'দেশের জনসাধারণের মধ্যে চিরকালের জন্য একটা শত্রুতার মনোভাব এবং নিজেদের দেশের মধ্যে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে বীজ সাম্রাজ্যবাদীরা বপন করে গিয়েছিল তাকেও পাকাপাকিভাবে স্থায়ী করে রাখা হ'ল। এ তো গেল আপসের মারফত স্বাধীনতা আদায় করতেই যে পরিমাণে ক্ষতি দেশের জনসাধারণকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়েছে তার একটা দিক। এত ক্ষতি স্বীকার করেও

সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করে যে স্বাধীনতা এসেছে এবং তার মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা জনস্বার্থকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মালিকদের, পুঁজিপতিদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই পুঁজিপতিশ্রেণীই হচ্ছে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রকৃত 'ডিক্টেটর' (একচ্ছত্র ক্ষমতাধিকারী)। অথচ আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়েছিল সাধারণ মানুষ।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে জহরলালের ভূমিকা

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে যে জহরলালকে এক সময়ে বলতে শুনেছিলাম যে, সামন্ততন্ত্রের উৎপাটন, কৃষকের উন্নতির বন্দোবস্ত করা এবং তাকে জমি দেওয়া, শ্রমজীবী জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা — এগুলো না করতে পারলে স্বাধীনতার কোন মানে নেই, সে রাজত্বের টিকে থাকবার কোন অধিকার নেই, ক্ষমতালাভের পর সেই জহরলালই উলটো সুরে গাইতে সুরু করেছিলেন। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে একটা সময়ে এই জহরলাল সম্পর্কে আমি বলেছিলাম, ভারতবর্ষের একচেটে পুঁজিবাদের হাতে সে একজন ক্রীড়নক, একটা যন্ত্র মাত্র। আমি ঠাট্টা করে বলতাম — ভারতবর্ষের একচেটে পুঁজিবাদের হাতে তিনি একজন জীবন্ত মাইক্রোফোন। ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি বড় বড় কথা বলবেন, মানবতাবাদের কথা বলবেন, তাঁর প্রতি দেশের জনসাধারণের যে মমতা রয়েছে, বিশ্বাস রয়েছে, সে বিশ্বাসকে পায়ে মাড়িয়ে বড় বড় কথা তিনি বলতে থাকবেন। মালিকরাই তাঁকে বলতে দিয়েছে, বড় বড় কথা বলে দেশের লোককে যাতে তিনি ঠাণ্ডা রাখেন, আর সেই সুযোগে মালিকদের যে গাঁটকাটার দরকার, দরিদ্র জনসাধারণের পকেটমারার দরকার, তা তারা যাতে নিরুপদ্রবে ও নির্বিঘ্নে করে যেতে পারে। সুতরাং জহরলাল ছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রেণীশাসনকে সংহত করার কাজে একটা সুবিধা, একটা প্রয়োজন। তা নাহলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েই মানুষ খেপে উঠত। জহরলালের ব্যক্তিত্ব তাদের ঠাণ্ডা রেখেছে। জহরলালের প্রতি বিশ্বাস তাদের ঠাণ্ডা রেখেছে। তারা আশা করেছে, পণ্ডিতজি যখন আছেন, তখন হবে — পণ্ডিতজি ভাল লোক, সৎ লোক, অন্তত মালিকদের কেনা গোলাম নন। তিনি মালিকদের কেনা গোলাম ছিলেন, একথা আমি বলছি না। কিন্তু তিনি কেনাই থাকুন, আর বিভ্রান্তই থাকুন, তিনি যদি 'ক্লিয়ারকাট্ কনসেপ্শনে' (সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে) 'রিভোল্ট' (বিদ্রোহ ঘোষণা) করতে না পেরে থাকেন, তিনি যদি পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াইকে স্তিমিত করার কাজে বুর্জোয়াদের হাতে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকেন, তিনি যদি মালিকশ্রেণীর রাজত্বের এই বুনিয়াদকে গড়তে সর্বতোভাবে সাহায্য করে থাকেন, তাহলে জনসাধারণের শত্রুতা এবং সর্বনাশ তিনি করেছেন একথা স্বীকার করতেই হবে, তিনি সৎ কি অসৎ সে প্রশ্ন ওঠে না।

পার্লামেন্টারি ইলেকশনের মোহ ছাড়তে হবে

এখানে পার্লামেন্টারি ইলেকশনের মধ্য দিয়ে গভর্নমেন্টের পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। একটা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যখন জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে তখন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আরেকটা গভর্নমেন্ট আসে। সাধারণ মানুষ কতকগুলো লোককে অসৎ মনে করে, ভাবে সেই লোকগুলোকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় অন্য কতকগুলো সৎ লোক এসে বসলেই তাদের মঙ্গল হবে। যে কোন 'নীতি' বা 'আদর্শে'র আড়ালে জনতাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের প্রচার বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতিবিদ্রা করে থাকে। কাজেই আমি শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষকে বলছি — তাঁরা যেন এ ধরনের ভাঁওতায় না ভোলেন। কারণ, শুধুমাত্র গভর্নমেন্টের পরিবর্তন হলেই সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান হয় না, হতে পারে না। গণতান্ত্রিক অধিকার, নিয়মকানুন পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় যতই হোক, যতই রিলিফ দেওয়ার পরিকল্পনা তারা জনসাধারণের জন্য গ্রহণ করুক, মুক্তি তার দ্বারা জনসাধারণের মিলবে না। বরঞ্চ জনসাধারণের অবস্থা দিনের পর দিন এর দ্বারা আরও খারাপ হবে।

আর, রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে এইভাবে সরকারের পরিবর্তনে কী হয়? না, যদি সৎ লোক আসে আরও মুস্কিল হয়। কারণ, সাধারণ মানুষের তাদের প্রতি বিশ্বাস থাকে। সৎ হয়েও যদি তারা বিভ্রান্ত হয় এবং যদি তারা বিপ্লবের পথে পা বাড়াতে না পারে, তাহলে তাদের পক্ষে কার্যত পুঁজিপতিশ্রেণীর

দালালি করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প থাকে না। তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই সংশোধিত, আরও সংহত করতে হয়। অথচ, তাদের প্রতি বিশ্বাসের ফলে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও জনগণের বিক্ষোভ স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে বুর্জোয়া শাসন, পুঁজিবাদী শাসন এইসব তথাকথিত সৎ 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর'-এর (প্রশাসকের) আমলে আরও সংহত ও পাকা বুনিয়াদ তৈরি করার সুযোগ পায় মাত্র। জহরলালের নেতৃত্বে ভারতীয় পুঁজিবাদও তাই আরও পাকাপোক্ত, আরও সুসংহত হয়েছে। তাই লেনিন বলেছিলেন, সৎ ধর্মযাজক ও অসৎ ধর্মযাজকের মধ্যে অসৎ ধর্মযাজকও ভাল এক অর্থে। সে অসৎ বলে ভাল, এই অর্থে নয়। এইজন্যই ভাল যে লোকে সহজেই তাকে চিনতে পারে। কিন্তু যদি সৎ অথচ বিভ্রান্ত ধর্মযাজক বিপ্লবের রাস্তা থেকে জনসাধারণকে সরিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে তাদের দুঃখদুর্দশার কারণ হিসাবে অদৃষ্টবাদ বোঝাতে থাকে তাহলে ক্ষতিটা বেশি হয়। কেন? কারণ মানুষ তাকে বিশ্বাস করে, আর মানুষের মুক্তি যে লড়াইতে, সমস্ত রকম শোষণের বিরুদ্ধে সেই লড়াইকে এড়িয়ে যাওয়ার শিক্ষাই তিনি জনতাকে দিয়ে থাকেন।

ভারতীয় অর্থনীতিতে সামরিকীকরণের ঝোঁক

স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যে গণমুক্তির উদ্দেশ্য ছিল তা সফল হয়নি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পাকাপোক্ত হচ্ছে তার সীমাবদ্ধ তা সত্ত্বেও। আর এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কারণের জন্যই পুঁজিবাদী শোষণের ফলে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে। পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্কট ও দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের সঙ্কটের সামনে, বর্ধিত বেকার সমস্যার সামনে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদের ক্ষমতা নেই আমূল ভূমি সংস্কার, অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য কৃষিতে যন্ত্রীকরণ করে। এ ক্ষমতা ভারতবর্ষের পুঁজিবাদের নেই। কারণ, কৃষিতে যন্ত্রীকরণ করতে গেলে গ্রামের যে লক্ষ লক্ষ লোক এক ধাক্কায় বেকার হয়ে যাবে, সেই বেকারদের কাজ দেবার মতো ক্ষমতা তাদের নেই। কারণ, শিল্পের অপ্রতিহত বিকাশের, অর্থাৎ অবাধ শিল্প বিকাশের রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ। আজকে যে শিল্পকারখানাগুলি আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখাই পুঁজিবাদের বড় সমস্যা। তাই ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্থিতাবস্থা খানিকটা বজায় রাখার জন্য আজকে তার কৃত্রিম উপায়ে বাজারে তেজিভাব সৃষ্টি করা দরকার হচ্ছে।

এই কৃত্রিম উপায়ে বাজারে তেজিভাব সৃষ্টি করা বলতে কী বোঝায়? অর্থাৎ স্বাভাবিক গতিতে বাজারে যেখানে চাহিদা নেই, সেখানে লোকের কেনবার ক্ষমতার ওপর নির্ভর না করে কলকারখানাগুলি যতটুকু চলছে ন্যূনতম পক্ষে সেগুলো সরকারি খরচায় চালু রাখা। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে 'ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি' (প্রতিরক্ষা শিল্প) বাড়ানো, মিলিটারি বাজেট বাড়ানো। এই যে 'ডিফেন্স প্রোডাকশন', অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন — এর খরচও গভর্নমেন্ট করে, কেনেও গভর্নমেন্ট। ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভর করতে হয় না। তাই আজকের বাজার সঙ্কটের যুগে ভারতীয় পুঁজিবাদের পক্ষেও ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে একটা মস্ত বড় জিনিস। এর থেকে পুঁজিপতিরা পেছনে হটতে পারে না। দেশের মানুষ খেতে পাক্ আর না পাক্, ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি বাড়াতে তাকে হবেই। লোককে বোঝানো হয় দেশ বিপদাপন্ন, এইজন্যই এটা করা হচ্ছে। আমি বলি, বিপদাপন্ন যত না, তার চাইতে বেশি কারণ এই অর্থনৈতিক সঙ্কটাবস্থা। নাহলে ভারতবর্ষের গোটা অর্থনৈতিক বুনিয়াদটি ধসে পড়বে।

পরিকল্পনা সঙ্কট থেকে মুক্ত নয়

এই যে ইস্পাতের উৎপাদন হচ্ছে, ইস্পাতের শিল্পকারখানা হচ্ছে — এইগুলি গড়বার সময় বলা হয়েছিল, দেশের আর্থিক উন্নয়ন হচ্ছে। অথচ এই সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম তখনই দুটো জিনিস। একদিকে শিল্পবিপ্লবের পরিকল্পনা হচ্ছে, শিল্পকারখানা গড়ে উঠছে, আরেকদিকে বহু গড়ে ওঠা শিল্পকারখানা হু হু করে লালবাতি জ্বালছে। ফলে একদিকে কিছু পরিমাণে লোকের চাকরির সংস্থান হচ্ছে, আবার যে পরিমাণ লোকের চাকরির সংস্থান হচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণ লোক ক্রমাগত চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে যাচ্ছে। তাই পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় আমরা আমাদের দল থেকে বলেছি যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এই যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো রচিত হয়েছে — এ সমস্ত পরিকল্পনাগুলো 'অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ শ্যাডো অব ক্রাইসিস্' (একটি সঙ্কটের ছায়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বাঁধা)। এ সমস্ত পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সবসময়ে

একটা ছায়া অনুসরণ করছে — সঙ্কটের ছায়া। সে সঙ্কটটা কী ? — বাজার সঙ্কট।

ইস্পাত তৈরি হ'ল। এখন ইস্পাত বিক্রি করতে হবে বিদেশের বাজারে। নিজের দেশে কে কিনবে ? শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার যদি একটা চাহিদা থাকে, পুঁজিবাদী অর্থেও যদি একটা চাহিদা থাকে — অর্থাৎ পুঁজিপতিরা মাল তৈরি করতে চাইছে, মানে বাজারে মালের চাহিদা আছে — দেশেই হোক্, বিদেশেই হোক্ বাজার আছে, পুঁজিপতিদের পুঁজি বিনিয়োগের একটা চাহিদা আছে। এই চাহিদা থাকলে শিল্পকারখানা করতে তারা চাইবে, তখন ইস্পাত তাতে কাজে লাগবে। কিন্তু সে চাহিদা নেই। দেশের অভ্যন্তরে সেই চাহিদা নেই তিনটি কারণে — বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, মজুরের কম মজুরি এবং আমূল ভূমিসংস্কার করতে না পারা। এই তিনটি কারণের জন্য ক্রমাগত দেশের বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে, লোকের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আর বিদেশের বাজারে প্রচুর প্রতিযোগী। সেখানে উৎপাদন ক্ষমতায় ভারতীয় পুঁজি তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। তাছাড়া নতুন নতুন অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো — তারাও নিজেরা প্রতিযোগিতায় আসছে। একদিকে বড় বড় পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে ও অপরদিকে অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা। ফলে সেই বাজারও খুব ভাল না। ফলে পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সঙ্কট।

পুঁজিপতিশ্রেণীর প্ররোচনামূলক প্রচার

এই যে ইস্পাতের উৎপাদন হয়েই যাচ্ছে সেগুলির যদি বাইরের বাজার না থাকে, ভেতরের বাজারও কিছুটা না সৃষ্টি করা যায়, তাহলে চলবে কী করে? সঙ্গে সঙ্গে মাল জমে যাবে, 'শিফ্‌ট' বন্ধ হবে, দুর্গাপুরে লালবাতি জ্বালতে হবে, রাউরকেল্লায়, ভিলাইতে লালবাতি জ্বালতে হবে। তাই রণদামামা। যুদ্ধ করতে হবে অর্থাৎ প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়ে বাজারে কৃত্রিম তেজিভাব সৃষ্টি করতে হবে — গভর্নমেন্ট ক্রেতা হয়ে এইসব ইস্পাত উৎপাদনের খানিকটা 'কনজিউম' (ক্রয়) করবে। অপরদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প-কারখানাগুলিকেও গভর্নমেন্ট নিজে খানিকটা অর্ডার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। এইভাবে বাজারে কৃত্রিম তেজিভাব সৃষ্টি না করলে এবং তার জন্য প্রতিরক্ষা বাজেট ও ডিফেন্স ইন্‌ডাস্ট্রি না বাড়ালে ভারতীয় পুঁজিপতিদের চলতে পারে না। অথচ একদিকে রাষ্ট্রনায়করা শান্তির পায়রা ওড়াচ্ছেন, অন্যদিকে দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে না, দেশে বেকার ভর্তি, বেকার ভাতা যা পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও দেওয়া হয়, এ দেশের পুঁজিপতিরা তা পর্যন্ত দেবার ক্ষমতা রাখে না, অথচ দলে দলে মানুষ বেকার হচ্ছে, ভূমিসংস্কার করার ক্ষমতা নেই। এমতাবস্থায় কোন্ মুখে তারা অস্ত্র বানাতে, ডিফেন্স ইন্‌ডাস্ট্রি বাড়াতে বলবেন? তাই আওয়াজ তোলা হচ্ছে, দেশ বিপন্ন। এ একটি ভয়ানক মাদকদ্রব্য। প্রত্যেক মানুষ আমরা দেশকে ভালবাসি। 'দেশ' কথাতে আমরা গরম হয়ে যাই, আমরা ভয়ানক 'সেন্‌সিটিভ' (আবেগপ্রবণ)। কিন্তু আমি বলি, বিচারবুদ্ধিকে যদি এমনভাবে আচ্ছন্ন হতে দিই, যাতে বারবার মালিকদের প্ররোচনামূলক প্রচারের দ্বারা আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি আর নাচতে থাকি তাদের হাতে, তাহলে তাদের চক্রান্ত কোনদিনই বুঝতে আমরা সক্ষম হব না এবং গণমুক্তির সংগ্রাম পরিচালনাও কঠিন হয়ে পড়বে।

এই প্রতিরক্ষা বাজেট ক্রমাগত না বাড়িয়ে বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের সামনে ভারতীয় পুঁজিপতিদের চলতে পারে না বলেই দেখা যাচ্ছে, পুরোপুরি শান্তির সময়েও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়করা এবং তাদের দালালরা সর্বদাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের একটা আশঙ্কার মনোভাব জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। ভাবখানা এইরকম যে, আমাদের খেয়ে ফেলল বলে! কে যে কখন এসে ভারতবর্ষকে গ্রাস করে ফেলবে তার কিছু ঠিক নেই! ফলে ডিফেন্স ইন্‌ডাস্ট্রির বাজেট কমাতে পারা যাবে না। বরঞ্চ ক্রমাগত বাড়াতে হবে। আসল রহস্য হচ্ছে, কৃত্রিমভাবে বাজারে তেজিভাব বজায় রাখার নীতিকে চালু রাখতে হবে। এই যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক মন্দা — তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিও সামরিকীকরণের দিকে একটু একটু করে ঝুঁকছে।

আমেরিকান অর্থনীতির সঙ্কট

যেমন সমস্ত আমেরিকান অর্থনীতির কাঠামো বালুর চরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়াজোড়া এখানে সেখানে স্থানীয় ও আংশিক যুদ্ধ সৃষ্টি করে কোনরকমে টিকে আছে। ওরা এইভাবে অপরের ঘর চড়াও হয়ে

সামরিক গুন্ডামির নাম দিয়েছে — শান্তির জন্য লড়াই। কিন্তু অর্থনীতির ছাত্রেরা জানেন, শান্তি হল ওদের কবর, মৃত্যু। স্থানীয় এবং আংশিক যুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ হোক্ বা না হোক্, এখানে সেখানে ওর তার সঙ্গে যুদ্ধ তাদের চাই-ই। তাই আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তির পথে আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতান্ত্রিক আমেরিকা পা বাড়িয়েছে। কেন? কারণ ওদের সামনে সমস্যা আরও গুরুতর। ওদের বাজার নেই, কিন্তু বাড়তি পুঁজি। পুঁজি বসে থাকতে পারে না। তাহলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ অর্থনীতির ওপর পড়ে। ফলে পুঁজিকে তারা খাটাচ্ছে শিল্পের সামরিকীকরণের মারফত ক্রমাগত অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে। আবার অস্ত্রশস্ত্র যদি ক্রমাগত জমতে থাকে তাহলে সেই সমস্ত শিল্পেও মন্দা দেখা দেবে, মন্দার লক্ষণ দেখা দেবে, স্তিমিত ভাব আসবে। তখন গোটা দেশ বেকারে ফেটে পড়বে। এমনিতেই বেকার বাড়ছে আমেরিকায়। ফলে যুদ্ধ চাই। একের বিরুদ্ধে অপরের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করা, না হয় ওর সঙ্গে তাকে লাগিয়ে দেওয়া, ওর খবর তাকে পরিবেশন করা, তার খবর একে পরিবেশন করা — একদিকে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরি, অপরদিকে 'ক্যাশ অ্যান্ড ভায়োলেন্স'-এর নীতিই হচ্ছে বর্তমান আমেরিকান রাষ্ট্রনায়কদের যেকোন উপায়েই হোক্ যুদ্ধবিগ্রহকে উস্কানি দেওয়ার জঘন্য রাজনীতি। গত পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় একথাটা আমাদের দেশের জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। ওদিকে পাকিস্তানকে নাচিয়েছে, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে, পরিকল্পনা দিয়েছে, আবার পাকিস্তানের সমস্ত খবরাখবর সি-আই-এ'র গোয়েন্দা বিভাগ ভারতবর্ষকে জুগিয়েছে। কারণ এর পেছনে তাদের দু'টি উদ্দেশ্য কাজ করেছে। তারা রাজনৈতিক প্রভুত্ব এবং আধিপত্য দুই দেশের ওপরই বিস্তার করতে পারবে, আর কিছু অস্ত্রশস্ত্র খালাস করতে পারবে। এই অস্ত্র খালাস যদি না করতে পারে তাহলে আমেরিকাকে তার বিরাটত্ব নিয়ে একেবারে গহ্বরে ডুবে যেতে হবে। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী দুনিয়ার শিরোমণি আমেরিকার অর্থনীতির নিজের সঙ্কটের চেহারা।

আর এই অবস্থায় ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ও কাঠামো বজায় রেখেই দেশের সম্পদ এবং উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি করা যাবে এবং তার দ্বারা দেশের মানুষের সমস্ত দুঃখদুর্দশা দূর হয়ে যাবে — এ কথা যারা বলে তারা না সমাজতত্ত্বের ছাত্র, না ইতিহাসের ছাত্র, না অর্থনীতির ছাত্র। তারা কোন কিছুরই ছাত্র নয়। হয় তারা কিছুই জানে না, আর না হয় শয়তান। তাই ভারতবর্ষের মুক্তির মূল প্রশ্নটি এই জায়গায়। পুঁজিবাদ সঙ্কট জর্জরিত। ভারতে অবাধ শিল্পবিকাশের দ্বার খুলে দিতে হলে, শিক্ষার সুযোগ অবারিত করতে হলে, আমূল ভূমি সংস্কার এবং কৃষিতে যন্ত্রীকরণ করে উৎপাদনকে দ্বিগুণ, চৌগুণ — এইভাবে ক্রমাগত বাড়াতে বাড়াতে ভারতের খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে হলে ভারতবর্ষের শিল্পবিপ্লবের দ্বার খুলে দিতে হবে। আর সেই দ্বারটি আটকে রেখেছে পুঁজিপতিদের শাসন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই হচ্ছে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বর্তমান সঙ্কটের চেহারা, যাকে উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারলে সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার হাত থেকে মুক্তি নেই।

পুঁজিবাদী সমাজের মৌলিক অবিচার

এছাড়াও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আর একটি মৌলিক 'ইন্‌জাস্টিস'-এর (অবিচারের) দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। দুশো-পাঁচশো বছর আগে, পুঁজিবাদ বিকাশের আগে মানুষের শ্রমশক্তির চরিত্র কী ছিল? লোকে পরিশ্রম করত নিজের ভোগের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করার জন্য। আর খানিকটা বাড়তি উৎপাদন করত — তাও নিজের ভোগের উদ্দেশ্যেই বিনিময় করার জন্য। মানে সাধারণ মানুষের উৎপাদন শক্তির মালিকানা, শ্রমশক্তির মালিকানা তাদের নিজেদের হাতেই ছিল। আর আজ যারা খেটে খান — 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্' শ্রমিকই (বৌদ্ধিক শ্রমজীবী) হোন, অথবা যারা কায়িক শ্রম করেন তাঁরাই হোন, কৃষক-মজুরই হোন, আর প্রফেসরই হোন — তাঁদের শ্রমশক্তির মালিক তাঁরা নন। তাঁদের শ্রমশক্তি আজ পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁদের শ্রমশক্তির মালিকানা আজ মালিকশ্রেণীর হাতে — মালিকরা কেনে-বেচে, শর্ত দেয়, সেই অনুযায়ী শ্রমিক শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে সাধারণ মানুষের শ্রমশক্তির চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে কী? না, তারা নিজের জন্য আর পরিশ্রম করে না। উৎপাদনের মধ্যে তাঁদের পরিশ্রম 'এমবডিড্' (মিশে) আছে। সেই অর্থে সাধারণ মানুষের শ্রমও আজ সামাজিক হয়ে গেছে। তার চরিত্র সামাজিক। মালিকরা যে উৎপাদন করে তা কি নিজে ভোগ করার জন্য করে? না, বাজারে বিক্রির জন্য করে।

অর্থাৎ মালিকরা এ সমাজে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করে। যদিও মালিকরা প্রকাশ্যে বলে, উৎপাদন হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য, অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজনেই নাকি উৎপাদন। তাহলে উৎপাদনের চরিত্র আজকে আমাদের দেশে — জমির ফসলের ক্ষেত্রেই হোক্, আর শিল্প-কলকারখানার ক্ষেত্রেই হোক্ — হয়ে গেছে সামাজিক। উৎপাদনের চরিত্র হয়ে গেছে সামাজিক। তাই উৎপাদন যারা করেন সেই শ্রমশক্তির চরিত্রও হয়ে গেছে সামাজিক। অথচ উৎপাদনের মালিকানা রয়ে গেছে ব্যক্তিগত। এই যে উৎপাদন ও শ্রমশক্তির চরিত্র সামাজিক, আর মালিকানার চরিত্র ব্যক্তিগত — এই হ'ল এই সমাজের মূল অসামঞ্জস্য এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচারের মূল বুনিয়াদ। আর এই যে 'প্রাইভেট রাইট অব এক্সপ্রোপ্রিয়েশন' (আত্মসাৎ করার ব্যক্তি অধিকার), অর্থাৎ সামাজিক শক্তি থেকে উদ্ভুত সম্পদকে ব্যক্তির আত্মসাৎ করার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার, সেই অধিকার রক্ষা করাই হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলার কাজ। তাই আমি বলি, আমাদের সমাজে যে আইন-শৃঙ্খলার কাঠামো তার মূল বুনিয়াদ হচ্ছে এই 'সোস্যাল ইন্‌জাস্টিস' (সামাজিক অবিচার)। অর্থাৎ আমাদের দেশে যে ন্যায়বিচারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে আইন-শৃঙ্খলার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত, তা মূলত এই সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শ্রমের চরিত্র সামাজিক, শ্রমিক সমাজের জন্য কাজ করে, উৎপাদন সমাজের জন্য হচ্ছে; অথচ মালিকানা ব্যক্তিগত। আর সেই ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকে রক্ষা করার নাম হ'ল আমাদের দেশে আইন-শৃঙ্খলার বুনিয়াদী নীতি। এ কি ন্যায়বিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? না, সামাজিক অন্যায় অবিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ?

ন্যায়নীতি, জুরিস্‌প্রুডেন্স ও আইন-শৃঙ্খলার সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ

তাই একটা কথা গত ২৪শে এপ্রিল ময়দানের[১] জনসভায় আমি প্রথম বলি, আর তা নিয়ে হৈ চৈ খুব হচ্ছে। আমি একটা কথা বলেছিলাম যে, ন্যায়নীতি এবং জুরিস্‌প্রুডেন্সের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে, যাহাই আইনসঙ্গত তাহাই সবসময় ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং মানবিকতাসম্মত নাও হতে পারে। আবার কোন জিনিস প্রচলিত আইনের চোখে বে-আইনি হলেই তা অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অমানবিক হয় না।

এই কথাটা 'প্রিন্সিপ্‌ল্ অব জুরিস্‌প্রুডেন্সে'র (ন্যায়শাস্ত্র) খবর যাঁরা রাখেন — কী করে জুরিস্‌প্রুডেন্স গড়ে উঠল, কী করে জুরিস্‌প্রুডেন্স-এর নীতিগুলো পাল্‌টাচ্ছে, 'গ্রো' করছে, 'ডেভেলপ' করছে, তার ইতিহাস যাঁরা জানেন —তাঁরাই জানেন যে, বুর্জোয়া 'সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট স্টেট' (ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী রাষ্ট্র) এবং তার বর্তমান 'ল অ্যান্ড অর্ডার'-এর ধারণা একদিন ইতিহাসে কীভাবে 'অ্যাব্‌সলিউটিজ্‌ম্'-এর (সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র) বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। উপরন্তু 'এথিক্‌স্'-এর (নীতিশাস্ত্রের) ছাত্রমাত্রেরই জানা উচিত যে, ন্যায়নীতি ও আইন-শৃঙ্খলার জন্য মানুষ বা মানুষের সমাজ নয়, বরং মানুষ এবং মানব সমাজের অগ্রগতি ও প্রগতির প্রয়োজনেই আইন-শৃঙ্খলা ও ন্যায়নীতির ধারণা গড়ে উঠেছে।

সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, একদিন সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের প্রয়োজনে যে মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতির ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থা ও তার আইন-শৃঙ্খলার কাঠামো গড়ে ওঠে তা তদানীন্তন সমাজের প্রয়োজন মেটাতে পারলেও কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধীরে ধীরে সেই বিশেষ মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি, সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা ও আইন-শৃঙ্খলার কাঠামো একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীর বিশেষ সুবিধাতে পর্যবসিত হয় ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ধারণ করে। ফলে সমাজের অভ্যন্তরে সমাজ প্রগতির স্বার্থেই নতুন প্রয়োজনকে ভিত্তি করে আবার নতুন মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার সৃষ্টি হয়। পুরনো মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার সাথে সমাজ প্রগতির স্বার্থেই গড়ে ওঠা এই নতুন মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সংঘাত হচ্ছে আসলে পুরনো সমাজব্যবস্থা ও তার আইন-শৃঙ্খলার সাথে সংঘাত — নতুন ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে নতুন সমাজব্যবস্থা ও তার আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লড়াই। যুগে যুগে এরূপ সংঘর্ষ ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই মানবিক মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি, সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা এবং তাকে ভিত্তি করে 'ল অ্যান্ড অর্ডার'-এর 'কনসেপ্‌শন' (ধারণা) ক্রমাগত রূপ পালটাতে পালটাতে আজকের

অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এইভাবেই একদিন 'স্লেভ-মাস্টার সোসাইটি' (দাস-দাসপ্রভু সমাজ) ভেঙে গিয়ে 'অ্যাব্সলিউটিজ্ম্'-এর সৃষ্টি হয়েছিল। আবার অ্যাব্সলিউটিজ্ম্-এর (চরম কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার) ভিতরেই যখন পুঁজিবাদী বিপ্লব এবং গণতন্ত্রের ভাবনা জন্ম নিতে শুরু করল, তখন অ্যাব্সলিউটিজ্ম্-এর আইন-শৃঙ্খলার ধারণা, ন্যায়বিচারের কনসেপ্শন, ন্যায়নীতির কনসেপ্শন, 'ডিভাইন রিজনিং'-এর (ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার যুক্তিজাল) পুরো কাঠামোর বিরুদ্ধে মানুষের 'রিভোল্টিং' (বিদ্রোহী) মনোভাব গড়ে উঠল। এই বিপ্লবাত্মক মনোভাব তদানীন্তন সময়ে প্রচলিত আইন-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও তা 'মর‍্যাল', 'লেজিটিমেট' এবং 'জাস্টিফায়েড' ছিল। অথচ সেদিন সে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কারা? এই আজকের বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার অধিনায়করা। 'আইন' 'আইন' বলে আজ যাঁরা চিৎকার করছেন তাঁরা সেদিন অ্যাব্সলিউটিজ্ম্-এর বিরুদ্ধে বলেছিলেন — যা যুক্তিসঙ্গত নয়, তা আইনসঙ্গত হলেও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দাও। তাদের মুখ থেকে এ কথা ধ্বনিত হয়েছিল কেন? না, অ্যাব্সলিউটিজ্ম্-এর ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা সমাজের বেশিরভাগ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল এবং সেই অর্থে সমাজপ্রগতির স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল।

বর্তমান সমাজের আইন-শৃঙ্খলা পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে রচিত

আজ সমাজে যে আইন, ল অ্যান্ড অর্ডারের যে কাঠামো, তা পুঁজিপতিশ্রেণীর শ্রেণীশাসনের পরিপূরক অর্থে রচিত — পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন, সামাজিক সম্পত্তির ওপর তাদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার, তা যে 'ফর্মে'ই হোক্, তাকে রক্ষা করার স্বার্থেই রচিত, যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাই হচ্ছে আজকের সমাজের অগ্রগতির সামনে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। ফলে এই সমাজে যে ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে ল অ্যান্ড অর্ডার-এর বর্তমান কাঠামোটি প্রতিষ্ঠিত তা আজ পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে তাদের শাসন ও শোষণকে পাকাপোক্ত করার স্বার্থে একটি সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। কাজেই কোন প্রগতিবাদীই সামাজিক অন্যায়-অবিচারের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান সমাজে যে ল অ্যান্ড অর্ডার — তাকে বশংবদের মতো মেনে চলতে পারে না। নিজেকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও প্রগতিবাদী বলে জাহির করব, অথচ নতুন ন্যায়নীতিবোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর গড়ে ওঠা গণআন্দোলনগুলোকে সমর্থন করতে ভয় পাব, এ চলতে পারে না।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শিল্পের জাতীয়করণ মানেই সমাজবাদ নয়

আর একটি জিনিস আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে একদল বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোদ্যোগ হচ্ছে দেখে 'সমাজবাদ' বলে খুব চিৎকার করছেন। অথচ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শিল্পের জাতীয়করণ করলেই তার দ্বারা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঠিক এরকম করেই কংগ্রেসিরা জনসাধারণকে বোঝাতে চাইছে যে, তারা ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে। এ একটি মস্ত বড় ধাপ্পা। বুদ্ধিজীবীদের বুঝতেই হবে যে, মালিকানা ব্যক্তিগতই হোক্ আর রাষ্ট্রায়ত্তই হোক, তার দ্বারা পুঁজিবাদ কি সমাজবাদ তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় না। মার্কস্ যখন বলেছেন পুঁজিবাদ — তখন তিনি বুঝিয়েছেন উৎপাদনের উদ্দেশ্য, বুঝিয়েছেন উৎপাদন-সম্পর্ক। অর্থাৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন, আর উৎপাদন সম্পর্ক হচ্ছে মালিক-মজুর সম্পর্ক। যেমন আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির কথাই ধরা যাক। সেখানে মজুরদের 'এমপ্লয়মেন্ট পলিসি'তে (নিয়োগ নীতিতে) কোন হাত নেই, 'প্রোডাকশান প্ল্যানিং'-এ (উৎপাদন পরিকল্পনায়) কোন হাত নেই — সেখানে পরিচালন ব্যবস্থা কীভাবে চলবে, মজুরি নীতি কী হবে গভর্নমেন্টের, তা মজুররা নির্ধারণ করে না। অর্থাৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জনই রয়ে গেল এবং মালিক-মজুর সম্পর্কও একই রইল। মজুররা শুধু দাবি করবে, লড়বে —যেমন ব্যক্তিগত মালিকের বিরুদ্ধে করে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় জাতীয়করণ করা হলেই তা 'সোস্যাল ওনারশিপ' (সামাজিক মালিকানা) বোঝায় না। তা, 'এগ্রিগেট ক্যাপিটালিস্ট ইন্টারেস্ট' (পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থ) প্রতিফলিত করে মাত্র। এটা পুঁজিবাদী শোষণের একটা বাড়তি সুবিধা। সেটা কী? ব্যক্তিগত মালিক অন্যায় করলে লোকে সহজেই তার ওপর খেপে ওঠে। আর যখন 'এগ্রিগেট ক্যাপিটালিজ্ম্'-এর (সামগ্রিক পুঁজিবাদের) স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত

শিল্পগুলোতে অবিচার করা হয় তখন তার একটা বড় মধুর বুক্‌নি থাকে — জাতির সম্পত্তি, জাতীয় সম্পদ। পেটে থাপ্পড় মেরে জাতীয় সম্পদের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে হবে — কারণ এ সম্পদ জাতির ! তাই মনীষী ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বলে গেছেন, রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প পুঁজিবাদী সমাজে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে অমানবিক এবং সবচেয়ে নির্মম শোষক। কারণ তার একটা আবরণ আছে — জাতীয়। অথচ বাস্তবে সেটা সত্য নয়।

একমাত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক রিফর্মের আন্দোলনই বিপ্লবীরা করে

তাই এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকে থাকবে, আর আমরা তাকেই 'রিফর্ম' (সংস্কার) করার চেষ্টা করব, এই কাঠামোর মধ্যেই পরিকল্পনা করার চেষ্টা করব, জনগণের মঙ্গলের কথা ভাবব — এগুলো 'সেল্‌ফ্‌ ডিসেপ্‌শন' (আত্মপ্রতারণা), নিজেদের ঠকানো, অপরকে ঠকানো। রিফর্ম-এর (সংস্কারের) সংগ্রাম এখানে হতে পারে, রিলিফ-এর সংগ্রাম এখানে হতে পারে জনগণের 'বেনিফিট'-এ (স্বার্থে)। কিন্তু তার সঙ্গে একটি উদ্দেশ্য থাকা চাই — সেটি হ'ল এইসব রিফর্মগুলো এবং এইসব রিলিফ-এর কার্যক্রমগুলো নেওয়ার যে আন্দোলন তা ভারতবর্ষের পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের রাস্তাকে প্রশস্ত করবে, তাতে বাধা সৃষ্টি করবে না। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, পার্লামেন্ট সম্বন্ধে মোহ সৃষ্টি করবে না। মোহমুক্ত করতে সাহায্য করবে। তাই তেমনভাবে যদি রিফর্মের আন্দোলন হয় সে রিফর্মের আন্দোলন বিপ্লবীরা সমর্থন করে, আমাদের দলও সমর্থন করে। যে রিফর্ম বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে না তা প্রতারণা, জনসাধারণকে মধুর বুক্‌নির আড়ালে সাময়িকভাবে স্তিমিত করে রাখার একটা বুর্জোয়া অপকৌশল মাত্র। ১৫ই আগস্ট এই কথাগুলো আমরা বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

উৎপাদনের অবাধ বিকাশকে উন্মুক্ত করার জন্যই বিপ্লব

দু'টি দিকে লক্ষ্য রেখেই গণমুক্তির লড়াই জনসাধারণকে পরিচালনা করতে হবে — যে স্বাধীনতা এসেছে তাকে রক্ষা করা যেমন দায়িত্ব, তেমনি বিপ্লবের জন্যও নিরলসভাবে সর্বব্যাপক প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতা হয়েছে বলে গণমুক্তির প্রশ্ন নেই, বিপ্লব নেই — এই কথাও ঠিক নয়। বিপ্লব মানে দেশের মধ্যে ঝামেলা ডেকে আনা, উৎপাদন ব্যাহত করা, উৎপাদন নষ্ট করা, দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করা — এ যারা বলে তারা মিথ্যেবাদী। কারণ বিপ্লবের অর্থ উৎপাদন ব্যাহত করা নয়। বরঞ্চ উৎপাদনকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল 'রিসেশন' (মন্দা) ও সঙ্কট থেকে মুক্ত করা, বিজ্ঞানকে পুঁজিবাদী মুনাফার লক্ষ্য থেকে মুক্ত করা। পুঁজিপতিদের লোভ, মজুরদের ঠকিয়ে মুনাফা লোটার দরুন যে বাজার সঙ্কট এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট সেই সঙ্কট থেকে উৎপাদিকা শক্তিকে মুক্ত করা, উৎপাদনকে ক্রমাগত বাড়াবার রাস্তা খুলে দেওয়ার জন্যই বিপ্লব। বিপ্লবে সাময়িকভাবে উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এইজন্য যে, এই বিপ্লবকে সশস্ত্র ও হিংসাত্মক উপায়ে বাধা দেয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র বা বুর্জোয়াদের দালালরা। তাই সাময়িক গন্ডগোলে যে উৎপাদন ব্যাহত হয় তার দ্বারা একথা কোনদিক দিয়ে প্রমাণ হয় না যে, বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য উৎপাদনকে ব্যাহত করা। উপরন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য উৎপাদনকে মুক্ত করা। আর যারা বাধা দেয় তারা উৎপাদনের ক্রমাগত অগ্রগতির রাস্তা খুলে দিতে চায় না বলেই বাধা সৃষ্টি করে। আর এই বাধা সৃষ্টি করার ফলেই উৎপাদন আরও ব্যাহত হয়। তাই উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা কোন সংঘবদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলনেরই উদ্দেশ্য নয়। বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য উৎপাদিকা শক্তিকে পুঁজিপতিদের লোভ ও মুনাফার চক্কর থেকে মুক্ত করা এবং অবাধ গতিতে উৎপাদন বাড়িয়ে যাবার রাস্তা খুলে দেওয়া।

জনতার বিপ্লবী চেতনা ও সংঘশক্তি গড়ে তুলতে হবে

এখন আমরা 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে শুধু চিৎকার করলেই তো তা দানা বেঁধে উঠবে না। তার জন্য নানা প্রকার শোষণ, জুলুম, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো সঠিক কায়দায় ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনগুলো পরিচালনা করার মধ্য দিয়েই জনসাধারণের বিপ্লবী সংঘশক্তি ও জনগণের লড়াইয়ের নিজস্ব হাতিয়ারগুলিকে গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লবী নেতৃত্বের একটা সুস্পষ্ট ধারণা বিপ্লবী জনসাধারণের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা এবং বিপ্লব

বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মাঝখানে যে বিরাট জনসাধারণ — তাদের বিপ্লবের সমর্থনে টেনে আনতে হবে, তাদের মানসিকতাকে বিপ্লবমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। জনগণের বিপ্লবী গণআন্দোলনগুলি নির্ভীকভাবে পরিচালনা করতে গিয়ে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বিপ্লবের উপযুক্ত প্রস্তুতির পূর্বেই এমন কোন বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম বা সংগ্রাম কৌশল গ্রহণ করা না হয় যার দ্বারা অযথা অসময়ে বিপ্লবী শক্তির অপচয় ঘটে। এ কাজগুলি করতে হলে আমাদের দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধাদের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে, তা হ'ল বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের দালালদের রাজনৈতিক প্রচারের সমস্ত চালাকি ভেঙে দেওয়া।

শ্রেণীস্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রিফর্ম বুর্জোয়ারাও করে

যেমন ওরা জনসাধারণকে বুঝিয়ে থাকে, ন্যায়সঙ্গত হতে হলে তাকে আইনসম্মত হতে হবে। তা না হলে নাকি আইনের শাসনের কোন মানেই থাকে না। কথাটা একইসঙ্গে এদের অজ্ঞতা ও শয়তানির পরিচায়ক। কারণ আইনসম্মত না হলে যদি তা কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত না হয় তাহলে ন্যায়সঙ্গত কথাটা আলাদা করে বলবারই কোন মানে হয় না। অথচ ন্যায়সঙ্গত বলে একটা কথা আছে এবং ওদেরও তা বলতে হয়। ওদের জীবনেও এবং ওদের সমাজব্যস্থার মধ্যেও এই ন্যায়নীতির দাবি মেটাবার উদ্দেশ্যেই প্রচলিত আইনগুলোকে মাঝে মাঝে রিফর্ম করতে হয়, পাল্টাতে হয়, অবশ্য যা তাদের মূল শ্রেণীস্বার্থে আঘাত করে না। যেমন 'হিন্দু বিবাহ আইন' সংশোধন করা হয়েছে। আজ আবার আওয়াজ উঠেছে, মুসলমানদের বিবাহ আইন যেটা আছে তাকে পরিবর্তন করার। কারণ বর্তমানে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একজনের পাঁচটা স্ত্রী থাকবে, পুরনো হিন্দু বিবাহ আইনে এ অধিকার থাকলেও বুর্জোয়া নৈতিকতাবোধে এটা অনৈতিক, কুৎসিত ও কুরুচিকর। ফলে তা 'লেজিটিমেট'-ও নয়, ন্যায়সঙ্গতও নয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাধারণ অর্থেও ন্যায়সঙ্গত নয়। তাই হিন্দু বিবাহ আইন সংশোধন করা হ'ল। কারণ এটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ন্যায়নীতির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, এতে বুর্জোয়াদের মূল শ্রেণীস্বার্থে আঘাত লাগছে না। এক্ষেত্রে ন্যায়নীতি প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে যাওয়ার ফলে আইনকেই রিফর্ম করা হ'ল। কিন্তু সমাজ প্রগতির স্বার্থেই যদি কোন নতুন ন্যায়নীতির ধারণা বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তাহলে আইনের দোহাই দিয়ে তারা তার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করে। তখন ওরা বলে — এটা যেহেতু আইন, তাই মানতে হবে। আইন না মানলে কি শাসন চলে?

ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে

এরূপ একটি পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি যথার্থ ন্যায়নীতির দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শাসন পরিচালনা করতে চায়, যদি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের যে আভ্যন্তরীণ চাপ আছে তাকে হটাতে চায়, তাহলে প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলিকে দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করতে হবে, পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। কোনও দাবির ভিত্তিতে কোনও আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত, মানবতাসম্মত কি না তা নির্ভর করে তা বেশিরভাগ মানুষের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সমাজপ্রগতির পরিপূরক কি না তার ওপর। যদি সেই অর্থে কোনও গণআন্দোলন ন্যায়সঙ্গত এবং নীতিসম্মত হয় তাহলে তা প্রচলিত আইন-বিরুদ্ধ হলে সেই আইনকেই পাল্টাবার চেষ্টা করতে হবে। আর আইন পাল্টাবার সামনে বাধা যেটা আছে তাকে ভাঙবার জন্য সর্বতোভাবে গণআন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে। যে আইন পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে 'প্রিভিলেজ'-এ পরিণত হয়েছে, সুবিধাভোগীদের হাতে সুবিধার অস্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে, সমাজপ্রগতির চরিত্র হারিয়েছে, সেই আইনেরই সেবা করলে, তারই জয়গান গাইলে ন্যায়নীতির জয় হবে কী করে ? তাহলে নতুন ন্যায়নীতিবোধের ভিত্তিতে আইন পাল্টাবে কী করে? তাহলে জনস্বার্থের অনুকূলে আইনগুলো গড়ে উঠবে কী করে? অতএব মন্দ আইনগুলোকে পাল্টাতে হলে গণআন্দোলনের মারফত প্রবল জনমত সৃষ্টি করতে হবে। আর একথা মানতেই হবে যে, এই জনমতের প্রভাব সবার ওপরেই কাজ করে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ওপরেও এর প্রভাব পড়ে, আইন প্রণয়নকারীদের ওপরেও এর প্রভাব পড়ে, এমনকী যাঁরা বিচার করেন তাঁদের ওপরেও এই জনমত প্রভাব বিস্তার করে। জনমতের প্রভাব যদি না সৃষ্টি করতে পারা

যায় তাহলে খুব প্রগতিশীল আইনের ব্যাখ্যাগুলোও ন্যায়নীতিসম্মত হয় না, জনস্বার্থের অনুকূল হয় না, জনস্বার্থের পরিপূরক হয় না। তাহলে জনগণের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন আইনসম্মত না হলেও তাকে সমর্থন করতে হবে যদি প্রগতি এবং গণতন্ত্রের কথা তারা বলেন। আর তা না হলে গণতন্ত্র কথাটারই কোন মানে থাকে না। তাহলে গণতন্ত্র কথার মানে দাঁড়ায় আসলে শুধু আইনের দোহাই দিয়ে বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখার পক্ষে ওকালতি করা এবং যুগে যুগে যে সমস্ত 'ডেস্‌পট্‌রা (অত্যাচারী শাসকরা) শাসন করেছে তাদেরই মতো প্রচলিত আইন-শৃঙ্খলা ন্যায়নীতিসম্মত কি না — এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে শুধু 'আইন' 'আইন' বলে চিৎকার করা। একদল প্রচলিত আইনের সপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে সর্বকালের অত্যাচারী শাসকদের মতোই বলে বেড়াচ্ছেন, সরকারি গদিতে বসে আইনের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনকেই সমর্থন করা চলে না, এমনকী ন্যায়সঙ্গত হলেও না ; অর্থাৎ 'যাহাই আইনসম্মত তাহাই ন্যায়সঙ্গত নয়' — এ বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে, ডিবেট চলতে পারে, কিন্তু মন্ত্রীরা বা গভর্নমেন্ট এই নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। তাহলে বলতে হয়, যারা সরকারি গদিতে থাকবে তারা যেহেতু সরকারে গেছে তাই মানবিক কাজ করার অধিকার তাদের নেই। এদের মত মেনে নিলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, সরকারে শুধু তেমন লোকই চাই যাদের অমানবিক কাজ করার অভ্যাস আছে। তাহলে দাঁড়ায় কী? — দেশের আইন, তা সে ডেসপট-দের আইন হোক, জনস্বার্থের বিরোধী আইন হোক, সেই আইনের শাসন এবং যাঁতাকল স্টিম রোলারের মতো জনতার ওপর যারা চালাতে পারে তারাই হচ্ছে এদের মতে 'গুড অ্যান্ড আয়রন লাইক অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর' (ভাল এবং লৌহদৃঢ় প্রশাসক)। আমি বলি, এই যদি গভর্নমেন্ট পরিচালনার কথা হয় তাহলে তেমন গভর্নমেন্টে থাকতে হবে এমন কোন মানে নেই।

জনস্বার্থেই ব্যুরোক্রেসিকে কন্ট্রোল করতে হবে

আরেকটা জিনিস সরকারের গদিতে বসেই চোখে আঙুল দিয়ে জনতাকে দেখিয়ে দিতে হবে। বুর্জোয়া দালালরা বলে, গভর্নমেন্ট সর্বশক্তিমান। বিপ্লবের দরকার কী? বিদেশের তত্ত্ব ধার করে কতকগুলো লালঝান্ডাওয়ালা দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ডেকে আনতে চাইছে, বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার রয়েছে। জনসাধারণ ইচ্ছা করলেই তাদের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং সেই সরকার ইচ্ছা করলে নাকি জনস্বার্থের অনুকূলে যেমন যেমন আইন-কানুন করতে চায় করতে পারে। পুলিশ তো সরকারের অধীন, মিলিটারিও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা, সেক্রেটারিরাও তো সরকারের অধীন। আমরা চিরকাল বলে এসেছি, এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা। আসলে শাসন করে রাষ্ট্রের তিনটি 'অর্গ্যান' (অঙ্গ) — পুলিশ সহ ব্যুরোক্রেসি, মিলিটারি, জুডিশিয়ারি 'কম্বাইন্ডলি' (সম্মিলিতভাবে)। আর গভর্নমেন্টের মন্ত্রীরা হ'ল — ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। এই নিধিরাম সর্দাররা ওদের দালালি করে, ব্যুরোক্রেসির দালালি করে, তাই ব্যুরোক্র্যাটরাও ওদের 'স্যার' 'স্যার' করে। আর যে সব মন্ত্রীদের কাণ্ডজ্ঞান নেই তাঁরা ভাবেন তাঁরা মহাশক্তিমান। কিন্তু এইসব মন্ত্রীরা জানেন না যে, এই ব্যুরোক্রেসিকে যদি ওঁরা কন্ট্রোল করতে যান, পুলিশকে যদি ওঁরা পুলিশের শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে, অফিসারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে চালাতে যান জোর করে, তখনই ধরা পড়ে যাবে গভর্নমেন্টের কতটুকু ক্ষমতা! হাওড়া থানার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করে দিয়েছে গভর্নমেন্টের কতটুকু ক্ষমতা। সেখানে একটি থানা অফিসার 'রিভোল্ট' করে ডি এম-কে ধরে পেটে, মন্ত্রীর অর্ডার অগ্রাহ্য করে তারপরও বহাল তবিয়তেবসে আছে। আবার কোর্টের প্রোটেকশান চাইছে। সরকারের আমাদের এমন ক্ষমতা! তাই আমি বলি, এই যে 'মিথ্‌'টা (মোহটা) — গভর্নমেন্টে গেলেই সব হয়, গভর্নমেন্টের গদিতে থেকেই তাকে ভেঙে দিতে হবে। গভর্নমেন্টের গদিতে থেকে 'কন্‌স্টিটিউশন' (সংবিধান) অনুযায়ী যতটুকু ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা জনস্বার্থে ব্যুরোক্রেসিকে পুরোপুরি কন্ট্রোল করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সাহসের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। সেখানে ব্যুরোক্রেসির চাপের কাছে কোনমতেই নতি স্বীকার করা চলবে না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পুলিশকে সরকারের প্রগতিশীল নীতি অনুযায়ী চলতে বাধ্য করতে হবে। ন্যায্য গণআন্দোলনগুলোকে পুলিশি হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। এইসব নীতিগুলো অনুসরণের ক্ষেত্রে সরকারের গদিতে আমরা কতদিন আসীন থাকতে পারব, কি পারব না — এসব কোন প্রশ্নের দ্বারাই বিভ্রান্ত হলে চলবে না।

মালিকশ্রেণী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র ও কেন্দ্রীয় সরকারের যত চাপই থাকুক না কেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি এই কাজগুলো করতে পারে তাহলেই সত্যিকারের জনস্বার্থের অনুকূলে কাজ করা হবে। অন্যথায় জনতার আস্থাকে পদদলিত করে শেষপর্যন্ত জনস্বার্থের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'আইন' মালিকের স্বার্থকেই রক্ষা করে

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের সম্পন্ন করতে হবে। বুর্জোয়া দালালরা বলে, আইন হচ্ছে সবার জন্য সমান। এও একটা মিথ্যা কথা। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আইন সবার জন্য সমান — এটা লিখিত-পড়িত আছে মাত্র। বাস্তবে আইন হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য একটা 'মকারি' (প্রহসন)। আইনের সুযোগ মালিকদের। তাই আইন এ সমাজে মালিককে রক্ষা করে। পাঁচটা মালিক বদমাইশি করছে, হাজার হাজার মানুষ তার প্রতিকার চাইছে এবং চিৎকার করছে। গোটা দেশের শাসনযন্ত্র, প্রেস, প্রোপাগান্ডা, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টও ঐ পাঁচটা মালিকের পেছনে। ওদের কাছে দেশ হচ্ছে শুধুমাত্র ঐ পাঁচটা মালিক। আর মজুররা — যারা উৎপাদন করছে, দেশের সম্পদ গড়ে তুলছে, তারা কেউই নয়। তাই এদেশের আইনের কাজ হচ্ছে শেষপর্যন্ত মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা — মজুরদের স্বার্থ রক্ষা করা এর কাজ নয়। চাষীকে মেরে তছনছ করে দিচ্ছে, কত পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে — তাদের রক্ষা করার দরকার নেই, তাদের রক্ষা করা অবশ্যকরণীয় কাজ নয় আইনের এবং পুলিশের। কিন্তু একটা জোতদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন সাধারণ চাষীরা আন্দোলন গড়ে তোলে, জোতদার বিপদগ্রস্ত হয়, তখনই নাগরিকদের 'জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন' এই ধুয়া তুলে চাষীদের ওপর নেমে আসে আইনের খড়্গ। এই হ'ল এদেশের 'আইন ও শৃঙ্খলা'র আসল চেহারা। অথচ এহেন আইন-শৃঙ্খলার সপক্ষে কত ওকালতিই না আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা করে চলেছেন! গণআন্দোলনগুলো পরিচালনা করার সাথে সাথে জনসাধারণকে আমাদের দেশের আইন-শৃঙ্খলার এই সত্যিকারের চেহারাটা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একমাত্র মুক্তির পথ

এইসব আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভোটের মারফত হাজার বার গভর্নমেন্ট পাল্টে বা আক্ষরিক অর্থে আইনকানুন সংশোধন করার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা থেকে মুক্তি অর্জন অসম্ভব। এই মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে সঠিক বিপ্লবী কায়দায় পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জনসাধারণের অমোঘ বিপ্লবী সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। এছাড়া জনসাধারণের মুক্তির আর কোন দ্বিতীয় রাস্তা নেই। বাকি সব রাস্তাই হচ্ছে অযথা সময় নষ্ট ও আত্মপ্রতারণা মাত্র।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

১। পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে (১৯৬৭) কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানের জনসভা

১৫ই আগস্ট '৬৭ 'গণমুক্তি সংকল্প দিবসে'
কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আয়োজিত
জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।